নাজিব মাহফুজ, চলে যাবার এটাই কি শ্রেষ্ঠ সময়?

অবনি অনার্য

মৃত্যুভয় কখনো তাঁকে ভীত করেনি। কিন্তু, একবার বলেছিলেন, "একের পর এক সব আনন্দ যেদিন বিদায় হবে, বুঝতে হবে, চলে যাবার এটাই শ্রেষ্ঠ সময়।" বুঝতে তিনি পেরেছিলেন, তাই একদিন ৩০ আগস্ট ২০০৬, চিরনিদ্রায় নির্বাসিত হলেন জোড়াসভ্যতার ঔরসজাত সন্তান নাজিব মাহফুজ। আনন্দ বিদায় নেবারও যথেষ্ট কারণ আছে বলে ধারণা করা কঠিন নয়। পৃথিবীব্যাপি সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ, ধর্মীয় উগ্র মৌলবাদের উত্থান তাঁর আনন্দ নিঃশেষ করে দেবার জন্য যথেষ্ট। এই ধর্মীয় মৌলবাদের উত্থান কেড়ে নিয়েছে আমাদের আনন্দও– যে আনন্দ আমরা প্রত্যাশা করেছিলাম নাজিব মাহফুজের কাছ থেকে।

সাধারণ হিসাবে ৯৪ বছর কম সময় নয়; বরং দীর্ঘজীবন পেয়েছেন– এমনটা বলাই যায়। কিন্তু, আরব দুনিয়ার প্রথম নোবেল বিজয়ী সাহিত্যিকের কাছ থেকে শব্দে-শব্দে যে সত্য-সুন্দর-আনন্দ প্রত্যাশা করেছিলাম আমরা, সংকোচ না করে বলা যায়, সেটা আমরা পাইনি। ১৯৮৮ সালে নোবেল পুরস্কার লাভের পর নাজিবের আত্মজীবনী (*ইকোস অব অ্যান অটোবায়োগ্রাফি*) আর ছোট ছোট স্বপ্নগাঁথা (*ড্রিমস অব ইকিউপারেশন*) ছাড়া আর উল্লেখযোগ্য কোনো সাহিত্য আমরা পাইনি। এর পেছনেও আছে ধর্মীয় মৌলবাদের ভূমিকা।

মৃত্যুর আগ পর্যন্ত দেশের ভেতরের বাইরের রাজনৈতিক বিষয়াশয়ে সর্বদা সরব ছিলেন তিনি। মিশরের স্বাধীনতা থেকে শুরু করে গামাল আবদেল নাসের, আনোয়ার সাদাত কিংবা হোসনি মুবারকের শাসন, ইসরাইল-ফিলিস্তিন সংঘাত ইত্যাদি সব রাজনৈতিক সংকটে কখনো নিরপেক্ষ তথা নপুংসক ভূমিকা তার ছিলো না। নাসেরের শাসনের সমালোচনা যেমন করেছেন, তেমনি ইসরাইলের সঙ্গে শান্তিচুক্তির উদ্যোগের জন্য আনোয়ার সাদাতের প্রশংসা করেছেন। একসময় সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী নাজিব পরে উদার ইসলামী সূফীতত্ত্বের প্রতি আকৃষ্ট হন। তাঁর সাহিত্যকর্ম জুড়ে আছে রাজনীতির সরব উপস্থিতি। নিজেই বলেছেন, আমার সাহিত্যকর্ম কোনো-না-কোনোভাবে রাজনৈতিক। মানুষ মাত্রই রাজনৈতিক। নিজের লেখাকে তিনি রাজনীতি, বিশ্বাস আর ভালোবাসার ত্রিস্রোতের মিলনবিন্দু বলে উল্লেখ করেছেন। তাঁর লেখার একটা বিরাট অংশ জুড়ে আছে ধর্ম এবং নারী। উদার মানবতাবাদী এ সাহিত্যিক ১৯৯৪ সালের ১৪ অক্টোবর ইসলামী জঙ্গিবাদের নির্মম শিকার হন।

প্রতি শুক্রবার একটা কাফেতে তিনি আড্ডা দিতে যেতেন। নবীন কবি-লেখক-শিল্পী, কাছের বন্ধুদের সঙ্গে সপ্তাহের এই একটা দিন সময় কাটাতেন। যথারীতি বাড়ি থেকে বেরিয়ে এক বন্ধুর গাড়িতে চড়লেন। এক যুবক হাত বাড়িয়ে দিলে তিনিও হ্যান্ডশেক করার উদ্দেশে হাত বাড়িয়ে দিলেন। কিন্তু যুবকের হাতে ছিলো ধারালো ছোরা, উপর্যুপরি আঘাত করলো নাজিবের ঘাড়ের ডান পাশে। ড্রাইভার বন্ধু নিজেও একজন চিকিৎসক। চেপে ধরলেন ক্ষতস্থান, দ্রুত তাঁকে নিয়ে যাওয়া হলো হাসপাতালে। বেঁচে গেলেন বটে, কিন্তু ডান হাত আংশিক প্যারালাইজড হলো। ফলে লেখালেখি বন্ধ হলো। দীর্ঘ চিকিৎসায় হাতের শক্তি ফিরে পেলেও দিনে তিরিশ মিনিটের বেশি লিখতে পারতেন না। বিশ্বসাহিত্য এভাবেই বঞ্চিত হলো নাজিব মাহফুজের সৃষ্টিকর্ম থেকে। অথচ এই নাজিব মাহফুজেরই একেকটা উপন্যাস আছে পাঁচ শ পৃষ্ঠারও বেশি। প্রায় চল্লিশের মতো উপন্যাস, সাড়ে তিনশর মতো গল্প, বেশ কয়েকটি নাটক, অসংখ্য কলাম, পঁচিশটির মতো সিনেমার চিত্রনাট্য লিখেছিলেন তিনি। প্রায় সবই ওই ঘটনার আগে।

১৯১১ সালের ১১ ডিসেম্বর মিশরের রাজধানী কায়রোর গামালিয়াতে জন্মগ্রহণ করেন নাজিব মাহফুজ। তাঁর মতে, সাত হাজার বছরের পুরনো ফারাও সভ্যতা আর চৌদ্দশ বছরের পুরনো ইসলামী সভ্যতার দুধ পান করে, এবং এ দুই সভ্যতার শিল্প-সাহিত্য খেয়ে-পরে পূর্ণতা লাভ করেছেন তিনি। স্কুলজীবন শুরু হয় কোরান স্কুল-এ। দর্শনে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন কায়রো ইউনিভার্সিটি থেকে ১৯৩৪ সালে। কলেজ জীবনে সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবি-সম্পাদক সালামা মুসার লেখালেখির সঙ্গে পরিচিত হন। এই সালামা মুসার মাধ্যমেই বিজ্ঞান, সমাজতন্ত্র এবং সহনশীলতায় বিশ্বাস শুরু হয়; এবং ইনিই নাজিবের প্রথম উপন্যাস প্রকাশ করেন। নাজিব মাহফুজ লেখালেখি শুরু করেন ১৯২৯ সালের দিকে। নিজের লেখালেখির পেছনে সবচেয়ে বেশি ভূমিকা হাফিজ নাজিবের বলে উল্লেখ করেছেন নাজিব। হাফিজ নাজিব ছিলেন একজন চোর, দাগী আসামী এবং বাইশটি ডিটেকটিভ উপন্যাসের লেখক। দশ বছর বয়সে হাফিজ নাজিবের *জনসনস সান* পড়েন, এবং নিজের জীবন বদলে যেতে শুরু করে, বলেছেন নাজিব।

আরবি সাহিত্য কাব্যজগতে কিছু পরিমাণে ভূমিকা রাখলেও, গদ্যসাহিত্যে তেমন কোনো মহৎ সৃষ্টি ছিলো না। সেজন্যই, বোধ করি, নাজিব শুরু করেন গদ্য দিয়ে। প্রথমে প্রকাশিত হয় একটি প্রবন্ধ– *দ্য ডায়িং অব ওল্ড বিলিফস অ্যান্ড দ্য বার্থ অব নিউ বিলিফস*। এসময় গল্পও লিখতে শুরু করেন। প্রথম দিকের কোনো গল্পই সম্পাদকদের পছন্দ হয়নি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বরে , হিটলারের পোল্যান্ড আক্রমণকালে, তাঁর প্রথম গল্প *আবাথ আল আকদার (মোকারি অব দ্য ফেইটস)* প্রকাশিত হয়।

স্নাতক ডিগ্রি লাভের পর আর-রিসালা, আল-হিলার এবং আল-আহরামে সাংবাদিক হিসাবে কর্মজীবন শুরু করেন। এসময় পেশাদার সাহিত্যিক হবার পরিকল্পনাও তাঁর ছিলো। কিন্তু লেখালেখি দিয়ে উপার্জন করে সংসার চালানো কঠিন হয়ে পড়ে। সাত সন্তানের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ নাজিব তাই বাবার মতো নিজেও সরকারি চাকুরিতে যোগদান করেন ১৯৩৯ সালে। ১৯৫৪ সাল পর্যন্ত মিনিস্ট্রি অব ইসলামিক অ্যাফেয়ার্স-এ দায়িত্ব পালনের পর স্টেট সিনেমা অরগানাইজেশন-এর *ফাউন্ডেশন ফর সাপোর্ট অব সিনেমার* ডিরেক্টর পদে অভিষিক্ত হন। ১৯৬৯-৭১ সাল পর্যন্ত মিনিস্ট্রি অব কালচারের চলচ্চিত্র বিভাগের কনসালটেন্ট নিযুক্ত হন। এরপর সরকারি দায়িত্ব থেকে অবসরে যান। সরকারি চাকুরে থাকাকালীন সারাদিন অফিস শেষে নাজিব সাহিত্যকর্মের জন্য সময় দিতেন। আর এভাবেই বিশ্বসাহিত্যের খাতায় জমা হয়েছে নাজিব মাহফুজের বিশাল সাহিত্যকর্ম। এ থেকে বোঝা যায়, সাহিত্যের প্রতি কতোটা নিবেদিতপ্রাণ এবং সৎ ছিলেন নাজিব। পরিণত বয়সে, ৪৩ বছর বয়সে, ১৯৫৪ সালে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন আতিয়া ইব্রাহিমের সঙ্গে। তাঁদের দুই কন্যা– ওম কুলথুম এবং ফাতিমা।

নাজিব মাহফুজের প্রথম প্রকাশিত বই প্রাচীন মিশর নিয়ে লেখা জেমস বাইকির একটি বইয়ের অনুবাদ। এরপর নিজেই প্রাচীন মিশরের ইতিহাস নিয়ে তিরিশ খণ্ডের উপন্যাস সিরিজ লেখার কাজে হাত দেন। *আবাথ আল আকদার (১৯৩৯), রাদুবিস (১৯৪৩)* এবং*কিফাহ তিবাহ (১৯৪৪)*-এই তিন খণ্ড প্রকাশের পর প্রাচীন মিশর বাদ দিয়ে সমসাময়িক মিশর নিয়ে লেখার পরিকল্পনা করেন। দীর্ঘ সময় নিয়ে ১৯৫০-এ তিনি হাত দেন তাঁর বিখ্যাত সিরিজ *আল থুলাতিয়া (দ্য কায়রো ট্রিলজি)* লেখার কাজে। এ সিরিজের *বায়ান আল কাসরান (প্যালেস ওয়াক)* প্রকাশিত হয় ১৯৫৬ সালে, বাকি দুটো *কাস্ত আল শাওক (প্যালেস অব ডিজায়ার)* এবং *আল শুকারিয়া (সুগার স্ট্রিট)* প্রকাশিত হয় ১৯৫৭ সালে। কায়রো শহরের বিভিন্ন রাস্তার নামে তিনটি উপন্যাসের নামকরণ করা হয়েছে। কায়রো শহরেরই একজন আল-সাইদ আহমাদ আবদ আল-জাওয়াল, তার জীবন, পরিবার আর তিন প্রজন্মের কাহিনী বিশদ আকারে উপস্থাপন করা হয়েছে উপন্যাস তিনটিতে। কাহিনীর বিস্তার সেই প্রথম বিশ্বযুদ্ধ থেকে শুরু করে পঞ্চাশের দশকের মিশর পর্যন্ত। এই কায়রো শহরের রূপ রস গন্ধ মেখে বড় হয়েছেন নাজিব মাহফুজ, ফলে এর ভেতরের নির্যাস সুনিপুণভাবে উঠে এসেছে তাঁর *দ্য কায়রো ট্রিলজি*-তে। এ অসামান্য সাহিত্যকর্মের জন্য অনেক সমালোচকই তাঁকে চার্লস ডিকেন্স, বালজাক, টলস্টয়, দস্তয়েভস্কির পর্যায়ে বিবেচনা করতে শুরু করেন। নিজে তিনি কখনো নোবেল পাবেন, এমন ভাবেননি; কিন্তু তাঁর সাহিত্যসৃষ্টিতে মিশরের প্রখ্যাত সাহিত্যিক আব্বাস মাহমুদ এল-আকাদ '৮৬ সালের দিকে এক টিভি সাক্ষাৎকারে নাজিবকে বলেছিলেন যে, নোবেল পুরস্কার তাঁর প্রাপ্য। এসময়ে প্রকাশিত তাঁর অন্যান্য বইয়ের মধ্যে আছে *খান আল-খালিলি (১৯৪৪), আল-কাহিরা আল-জাদিদাহ (১৯৪৬), জুকাক আল-মিদাক (মিদাক অ্যালি, ১৯৪৭), ইগনিস ফাতাস (১৯৪৮), আল-সারাব (১৯৪৯), বিদায়া ওয়া-নিহায়া (দ্য বিগিনিং অ্যান্ড দ্য এন্ড, ১৯৪৯)*।

এরপর প্রকাশিত হয় তার আরেক বিখ্যাত বই *চিলড্রেন অব দ্য অ্যালি*। বইটিতে বিভিন্ন ঐতিহাসিক ক্যারেক্টার, যেমন মোজেস, জেসাস এবং মুহাম্মদ ইত্যাদি থাকার কারণে মিশরে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। তখন কিন্তু নাজিব মাহফুজ নিজেও সেন্সর বোর্ডের একজন সদস্য। এর আগে তাঁর *আল-কাহিরা আল-জাদিদাহ (১৯৪৬)* এবং *রাদুবিস (১৯৪৩)* নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়। ১৯৬১ সালে প্রকাশিত হয় *আল-লিস ওয়া আল-কিলাব (দ্য থিফ অ্যান্ড দ্য ডগস)*। উপন্যাসটিতে একজন মার্কসবাদী জেল থেকে ছাড়া পেয়ে তার স্ত্রীকে খুন করতে গিয়ে নিজেই শেষ পর্যন্ত খুন হয়। এরপর একে একে প্রকাশিত হয় *আল-সামানওয়া-আল-খারিফ (অটাম কোয়েইল,১৯৬২), আল-তারিক (দ্য সার্চ, ১৯৬৪), আল-শাহাদ (দ্য বেগার, ১৯৬৫), থারথারাহ ফাওক আল নিল (অ্যাড্রিফ্ট অন দ্য নিল, ১৯৬৬), মিরামার (১৯৬৭), আল-মারায়া (মিররস, ১৯৭১), আল-হাব তাহ্‌ত আল মাতার (১৯৭৩), ক্বাব আল-লাইল (১৯৭৫), হিকায়াত হারতিনা (ফাউন্টেন অ্যান্ড টম, ১৯৭৫), হাজরাত আল মুহতারাম (রেসপেক্টেড স্যার, ১৯৭৫), মালহামাত আল-হারাফিস (দ্য হারাফিস, ১৯৭৭), আরস আল-হাব (১৯৮০), আফরাহ আল-কাব্বাহ (ওয়েডিং সং, ১৯৮১), লায়লা আলফ লায়লা (অ্যারাবিয়ান নাইটস অ্যান্ড ডেইজ, ১৯৮১), আল বাকি মিন আল-জামান সা'হ (১৯৮২), রিহলাত ইবন ফাতুমা (দ্য জার্নি অব ইবন ফাতুমা, ১৯৮৩), আমাহ আল-আরাশ (১৯৮৩), আল-আইশ ফি আল-হাকিকাহ (১৯৮৫), আখেনাতেন (ডুয়েলার ইন ট্রুথ, ১৯৮৫), ইয়াউম মাকতাল আল জা'ইম (দ্য ডে লিডার ওয়াজ কিলড, ১৯৮৫), হাদিত আল-সাবাহ ওয়া আল-মাসা (১৯৮৭), থারথারাহ আলা আল-বাহ্‌র (১৯৯৩), ইকোস অব অটোবায়োগ্রাফি (১৯৯৪)*।

মিশরের সমসাময়িক সমাজকাঠামোর বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার মানুষের ব্যাপক উপস্থিতি থাকলেও, নাজিব মাহফুজের সাহিত্যে নারীর উপস্থিতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এক্ষেত্রে বিশেষভাবে তাঁর *দ্য কায়রো ট্রিলজির* কথা উল্লেখ করা যায়। ঘুরেফিরে বিভিন্নভাবে বোরখাবৃত নারী, শোষিত নারী, নাইটক্লাবের নারী থেকে শুরু করে সবচেয়ে বেশি আছে সম্ভবত পতিতাদের যাপিত জীবন। পতিতাদের সঙ্গে অন্যান্য নারীদের তূলনা আছে এরকম– অন্যান্যরা যেমন ভালোবাসা, প্রেম ইত্যাদির ভান করে, অন্তত পতিতারা সে ভানটুকু করে না। তাঁর সাহিত্যে এসব নারীচরিত্র নিয়ে নারীবাদীদের অনেক সমালোচনা আছে, কিন্তু নাজিব তাঁর উপন্যাসের চরিত্রদের স্বাভাবিক গতিতে হস্তক্ষেপ করেননি। মিশরের সমাজবাস্তবতায় দেহজীবিদের চরিত্র যেভাবে অগ্রসর হয়, সেটা তুলে আনার ক্ষেত্রে নাজিবের ভূমিকা ছিলো নৈর্ব্যক্তিক। কোনো বিশেষ চরিত্রের প্রতি দুর্বলতা থাকতে পারে সাহিত্যস্রষ্টার,

কিন্তু সেটা যদি ওই চরিত্রের স্বাভাবিক গতিকে প্রভাবিত করে, তখন সেটা আর সৎসাহিত্য থাকে না। এই সততা সাহিত্যের সততা, সামাজিক সততা নয়। ফলে, দেহজীবির চরিত্র তুলে ধরার ক্ষেত্রে সামাজিক যেসব অনুষঙ্গ উঠে আসে সেটার জন্য সাহিত্যিককে দোষ দেয়া যায় না। তাই বলে, সামাজিক বা ধর্মীয় মূল্যবোধের প্রতি নাজিব উদাসীন ছিলেন এমনটা মোটেও নয়। তিনি নিজে ধর্মকর্ম করতেন না, এটা ঠিক; কিংবা মক্কায় গেছেন কি-না, এমন প্রশ্নে বলেছিলেন, না, লোকজনের জটলা আমার পছন্দ নয়, কিন্তু সামাজিক-ধর্মীয় মূল্যবোধকে হেয় করার প্রয়াসের ঘোর বিরোধী ছিলেন নাজিব। সালমান রুশদীর স্যাটানিক ভার্সাস প্রকাশের পর ইরানের আয়াতুল্লাহ খোমেনি যখন রুশদীর বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করলেন, তখন তিনি বলেছিলেন, সামাজিক বা ধর্মীয় আচারের বিরোধিতা করার অধিকার মানুষের অবশ্যই আছে, বিপরীতে সমাজও ওই বিরোধিতার বিরোধিতা করে নিজেকে রক্ষা করার অধিকার রাখে। বিরোধিতা এক জিনিস, হেয় প্রতিপন্ন করা ভিন্ন; তাই ইসলামকে হেয় করার জন্য পরে তিনি রুশদীর সমালোচনা করেন এবং খোমেনির খড়্গহস্ত ভূমিকার জন্য তারও সমালোচনা করেন। খোমেনির সমালোচনার জন্য আরব বিশ্ব নাজিবের বিপক্ষে যায়। নিজের দেশেও ইসলামী মৌলবাদীদের চক্ষুশূল হন নাজিব।

সাহিত্যকর্মের পাশাপাশি মিশরের চলচ্চিত্রশিল্পেও নাজিব মাহফুজের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। চল্লিশের দশকে এক বন্ধুর মাধ্যমে পরিচয় ঘটে চিত্র পরিচালক আবু সাইফের সঙ্গে। প্রায় ২৫টি ছবির চিত্রনাট্য রচনা করেন নাজিব। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য– ইব্রাহিম আবুদের উপন্যাস অবলম্বনে *দ্য অ্যাভেঞ্জার (১৯৪৬)* এবং *দ্য অ্যাডভেঞ্চার অব আনতার অ্যান্ড আবলা*, এমিল জোলার উপন্যাস তেরেসা রাকিন অবলম্বনে *ইওর ডে উইল কাম (১৯৪৭), রায়া অ্যান্ড সাকিনা (১৯৫৩),* নিজের উপন্যাস অবলম্বনে *দ্য মোনস্টার (১৯৫৪),* এম সুবির উপন্যাস অবলম্বনে *দ্য বুলি (১৯৫৭), আ ক্রিমিনাল অন হলিডে (১৯৫৭),* ইহসান আবদুল কুদ্দুসের উপন্যাস অবলম্বনে *ব্লাইন্ড অ্যালি (১৯৫৭)* এবং *সার্চিং ফর মাই ফ্রিডম (১৯৫৮), বিটুইন আর্থ অ্যান্ড স্কাই (১৯৫৯),* নিজের উপন্যাস অবলম্বনে *দ্য বিগিনিং অ্যান্ড দ্য এন্ড (১৯৬০)* এবং *কায়রো ১৯৩০ (১৯৬৬),* এমিল জোলার উপন্যাস অবলম্বনে *দ্য ক্রিমিনাল (১৯৭৮)*। তাঁর নিজের প্রায় পঁয়ত্রিশটি উপন্যাস/গল্প চলচ্চিত্ররূপ পায়।

নাজিবের গল্প-উপন্যাস-প্রবন্ধে তিনি ক্ল্যাসিকাল আরবি সাহিত্য ব্যবহার করলেও সিনেমায় তিনি অনেক জায়গায় মিশরের স্থানীয় ভাষা ব্যবহার করেছেন। তিনি বলেছেন, সিনেমা খুব বেশি রিয়েলিস্টিক, তাই জনগণের মুখের ভাষা ব্যবহারের পক্ষপাতি তিনি। কিন্তু সাহিত্যে ক্ল্যাসিক আরবি ব্যবহারের বিষয়ে তাঁর ব্যাখ্যা, তাতে করে পুরো আরব অঞ্চলের মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ সম্ভব হয়।

কায়রো শহরের সঙ্গে নাজিব মাহফুজের সম্পর্ক আজীবন অবিচ্ছেদ্য ছিলো। জীবনে মাত্র দু-তিনবার তিনি কায়রো ছেড়ে গেছেন। এমনকি, নিজের নোবেল পুরস্কার নেবার জন্যও তিনি স্টকহোমে যাননি। তাঁর কাছের বন্ধু মোহাম্মদ সালমাবি তাঁর পক্ষ থেকে নোবেল লেকচার পাঠ করেন। সঙ্গে নাজিব মাহফুজের দুই মেয়েও ছিলেন। সেই নোবেল লেকচারেও উঠে এসেছে পৃথিবী জুড়ে অত্যাচার-নিপীড়ন, মানুষ হত্যার কথা, বস্তুগত অর্জনের বিপরীতে সত্য এবং ন্যায়বিচারের বিজয়ের উল্লাসের কথা। ফারাও শাসনামলে একবার শাসক জানতে পারলেন, হেরেমখানার ভেতরের মহিলাদের সঙ্গে বাইরের পুরুষের অবৈধ সম্পর্ক আছে। তখনকার দিনে কেবল এইটুকু তথ্যই সেই পুরুষ-মহিলাগুলোকে খুন করার জন্য যথেষ্ট ছিলো। কিন্তু শাসক সে কাজ না করে, আইনের লোক নিয়োগ করলেন প্রকৃত ঘটনা উদ্ঘাটনের জন্য, যাতে করে তাঁর রায় সত্য হয়, বিচার ন্যায্য হয়। তাই নাজিব বলেছেন, ফারাও শাসনকালের স্ফিংস কিংবা পিরামিডের মতো পৃথিবীর অত্যাশ্চর্য সৃষ্টিগুলোর কথা আমি বলতে চাই না। একদিন এসব পিরামিড-স্ফিংস ধ্বংস হয়ে যাবে, থাকবে কেবল সত্য এবং ন্যায়বিচার। ইসলামী সভ্যতা বিষয়ে একটা উদাহরণ দিয়েছেন এরকম– একবার বাইজেন্টাইনদের বিরুদ্ধে জয়ের পর তারা যুদ্ধবন্দীদের মুক্ত করে দিয়েছিলো গ্রিক ঐতিহ্যের কয়েকটি দর্শন, চিকিৎসাশাস্ত্র এবং গণিতের বইয়ের বিনিময়ে। ঈশ্বরবিশ্বাসী হয়েও জ্ঞানের প্রতি এই দুর্বার আকাঙ্ক্ষা পৃথিবীর সহিংষ ইতিহাসে বিরল। বলেছেন, বিজ্ঞানীদের কাজ যেমন পৃথিবীকে কলকারখানার দুষণ থেকে রক্ষা করা, তেমনি বুদ্ধিজীবিদের কাজ হচ্ছে মানবতাকে নৈতিক দুষণ থেকে রক্ষা করা। তিনি প্রকৃত বুদ্ধিজীবি বলে আজীবন সেজন্য কাজও করেছেন। আমাদের বুদ্ধিজীবিদের দিকে তাকালে অবশ্য উল্টোটা মনে হওয়া স্বাভাবিক। সাত বছর বয়সে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে বিপ্লব সংগঠিত হতে শুরু করে মিশরে। সেই স্মৃতি তাঁকে রাজনৈতিকভাবে সচেতন করে তোলে। আজীবন মানুষের পক্ষে সরব শ্লোগানে মুখর এই মহান মানুষ উগ্রপন্থীদের দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছেন যেমন, তেমন শারীরিকভাওে অসুস্থ হয়েছেন বেশ কয়েকবার। শেষের দিকে ডায়াবেটিসে আক্রান্ত হয়ে দৃষ্টিশক্তির মারাত্মক অবনতি হয়। নিজের বাসায় পড়ে গিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন, এবং চিরনিদ্রায় আত্মগোপন করেন। মৃত্যু বিষয়ে নিজের নোবেল লেকচারে মিশরের প্রখ্যাত কবি আবুল আ'লা আল মা'রি-র একটি কবিতা তিনি উল্লেখ করেছিলেন– "জন্মমুহূর্তের আনন্দের চেয়ে মৃত্যুকালীন দুঃখ শতগুণ ভারী"। কিছুদিন আগে কবি শামসুর রাহমান, দু'সপ্তাহ বাদে তাঁর মৃত্যুতে অনুজরা সেটা বাস্তবিকই টের পাচ্ছি।

aunarjo@gmail.com